

Vol. 29 | No. 1 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গীতিকবি কায়কোবাদ : ‘অমিয়ধারা' ও 'প্রেমের ফুল' কাব্যের প্রেক্ষিতে

Volume	29
Issue	1
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ফাতেমা কাওসার
Published online	October 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v29i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i1.4
Pages	70-108
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গীতিকবি কায়কোবাদ : 'অমিয়ধারা' ও 'প্রেমের ফুল' কাব্যের প্রেক্ষিতে

ফাতেমা কাওসার

কবি কায়কোবাদের (১৮৫৮-১৯৫২)[১] কবি-মানস ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দী, এই দুই শতকের কাব্য-ধারায় লালিত এবং তাঁর কাব্য-সাধনাও এই দুই শতকে বিস্তৃত। তিনি একদিকে মহা-কাব্যিক রচনা 'মহাশ্মশান' (১৯০৪)-এর কবি, অন্যদিকে গীতিকবিতা 'অশ্রুমালা' (১৮৯৪)-র কবি। বাংলা কাব্যের জগতে কায়কোবাদ তাই 'মহাকবি কায়কোবাদ' হিসেবে চিহ্নিত, আবার 'গীতিকবি কায়কোবাদ' হিসেবেও সুপরিচিত। তবে কায়কোবাদের সহজাত কবি-প্রবৃত্তি গীতি-কবিতা রচনাতেই পেয়েছে স্বতঃস্ফূর্ততা।

উনিশ শতকের শেষপাদে মহাকাব্য ও কাহিনী-কাব্যের ধারায় ব্যতিক্রমী সুর নিয়ে; আপন অন্তরের কথা নিয়ে; 'একলা কবির' কথা নিয়ে যিনি কাব্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি গীতিকবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৬৫-১৮৯৪)। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, বাংলা গীতিকবিতার জগতে 'ভোরের পাখী' হিসেবে পরিচিত বিহারীলালের প্রথম গীতিকবিতার সংকলন 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০) আর কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিরহ-বিলাপ' (১৮৭০) একই সময়ে প্রকাশিত। 'বিরহ-বিলাপ' কাব্যের কবিতাগুলো কায়কোবাদের সহজাত কবি-প্রাণের প্রকাশ। গীতিকবিতার অঙ্গনে বিহারীলালের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কায়কোবাদেরও প্রবেশ ঘটেছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানরা যখন দো-ভাষী পুথি সাহিত্য রচনায়-রত, অন্যান্যরা মহাকাব্য-কাহিনী-কাব্যের ধারায় বিচরণশীল এবং জাতীয়-জাগরণ-প্রয়াসে আগ্রহী, কায়কোবাদ তখন আবির্ভূত হলেন আপন অন্তরের দুঃখ-বিরহ-বেদনার

কথা নিয়ে, একান্ত নিজের কথা নিয়ে। তাই "আধুনিক বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে কায়কোবাদের আসন বিশিষ্ট-রূপে চিহ্নিত।"[২]

কায়কোবাদের কবি-কর্মের অধিকাংশই মহাকাব্য ও কাহিনীকাব্য-ধারার অনুসারী হলেও, কবি-হৃদয়ের যে গীতিধর্মিতা ও গীতিময়তা নিয়ে কাব্যজগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাকে তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি কখনও। এমন কি 'মহাশ্মাশন' কাব্যকে কবি 'মহাকাব্য' বললেও "··· এর প্রেরণা খাঁটি গীতি প্রেরণা। কবি-প্রাণের দুর্বার আবেগে 'মহাশ্মশান' হয়েছে গীতিমুখর। সমসাময়িককালে গীতিকবিতার কুলপ্লাবী তরঙ্গ এবং বাঙালী কবির উচ্ছ্বাসপ্রবণ মন ঐতিহাসিক মহাসংগ্রামের সমস্ত কোলাহলকে স্তব্ধ ক'রে, বেদনার করুণ সঙ্গীত ধ্বনিত ক'রে তুলেছে।"[৩] কাব্য ক্ষেত্রে গীতিকবিতার সুর নিয়ে, বিরহের বিলাপ নিয়েই কায়কোবাদের আবির্ভাব এবং এই গীতিকবিতার জগতেই তাঁর সফলতা এসেছে, কবি-প্রতিভা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আপন হৃদয়ের সুখ-দুঃখকে, অন্তরের বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুভূতিকে তিনি সহজ সরল-ভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর গীতিকবিতায়। "বাংলা কবিতার ইতিহাসে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং সেটি গীতি-কবি হিসেবে।"[৪] গীতিকবিতাতেই কায়কোবাদের কবি-প্রতিভা আপন মহিমায় উজ্জ্বল।

'বিরহ-বিলাপ' কাব্যটি কায়কোবাদের অল্প বয়সের রচনা। 'বিরহ-বিলাপে'র পর, কবির পরবর্তী কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, যখন কবির বয়স মাত্র পনর বছর। কাব্যটির নাম 'কুসুম-কানন'। দু'টি কাব্যই কবির অপরিণত বয়সের রচনা। তাই এ দু'টিতে কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর এতো স্পষ্ট নয়। গীতিকবিতার অঙ্গনে প্রবেশের জন্যে কাব্য দু'টি কবির প্রস্তুতির বাহন মাত্র।

গীতিকবিতার ধারায় কায়কোবাদের বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ 'অশ্রুমালা' (১৮৯৪)। অশ্রুমালা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবি গীতিকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। এ সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন, "... বহুদিন হইল আমি 'অশ্রুমালা' লিখিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলাম।

বঙ্গীয় হিন্দু মুসলমান সাহিত্যিকগণ উহা খুব আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[৫] তৎকালীন সমালোচকদের কয়েকটি অভিমত থেকে আমরা কবির এ উক্তির সত্যতার প্রমাণ পাই।[৬]

বস্তুতঃ 'অশ্রুমালা' 'কবির উৎকৃষ্ট খণ্ড কবিতার সংকলন।[৭] কাব্যটির মূল সুর প্রেম। প্রেম আর প্রকৃতি এ দু'য়ের প্রতি অন্যান্য কবির মতোই কায়কোবাদের রয়েছে সহজাত আকর্ষণ। শুধু অশ্রুমালায়-ই নয় তাঁর প্রায় সব কাব্যেই প্রেম ও প্রকৃতি এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। হৃদয়ের অন্তরঙ্গ অনুভূতির সহজ-সরল গীতিমুখর প্রকাশে 'অশ্রুমালা' কাব্যে কায়কোবাদ একজন সার্থক গীতিকবির পরিচয় দিয়েছেন।[৮] বর্তমান আলোচনায় আমরা কবির পরবর্তী গীতি-কবিতার সংকলন 'অমিয়-ধারা' ও 'প্রেমের ফুল' কাব্য দু'টির প্রেক্ষিতে গীতিকবি কায়কোবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী। অবশ্য বিষয়-বৈচিত্র্য ও প্রকাশ-রীতির দিক থেকে কাব্য দু'টিতে 'অশ্রুমালা'রই অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

দুই

'অমিয়-ধারা' প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। এ কবিতা সংকলনটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত। কাব্যের শুরুতে 'উৎসর্গ' ও 'উপহার' শিরোনামে দু'টি কবিতা ছাড়াও প্রথম খণ্ডে একুশ' পাঁচটি, দ্বিতীয় খণ্ডে এগারটি এবং তৃতীয় খণ্ডে চারটি কবিতা রয়েছে। এ কাব্যের প্রথম খণ্ডের অধিকাংশ কবিতাই নারীর প্রেম ও অধ্যাত্মপ্রেম-ভাবনামূলক। অবশ্য অধ্যাত্ম-প্রেম চেতনাই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। এ ছাড়া প্রথম খণ্ডে আমরা প্রকৃতি-প্রেম, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি প্রীতি এবং অন্যান্য বিষয়ের কবিতাও পাই। দ্বিতীয় খণ্ডের দশটি কবিতাই মুসলিম গৌরব-সূচক জাতীয় জাগরণের লক্ষ্যে রচিত। অশ্রুমালা কাব্যের ন্যায় এ কাব্যেও কবির কাব্যভাবনায় বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। গীতি-কবিতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে কায়কোবাদ নিজেই বলেছেন, "উহা সুগন্ধি ফুলের মতো কবি-হৃদয়ের নানা সময়ের নানা ভাবের অভিব্যক্তি।"[৯] এই 'নানাভাবে'র অভিব্যক্তিতে কায়কোবাদের গীতি-কবিতা সমৃদ্ধ।

মানব-প্রেম, স্বদেশ-প্রেম, প্রকৃতি-প্রেম, অধ্যাত্ম-প্রেম প্রভৃতি বিষয়ের মতো জীবন-জিজ্ঞাসা, আনন্দ-বেদনা, বিরহ-হতাশা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, প্রিয়ার রূপ-সৌন্দর্য, মান-অভিমান, ফুল-পাখী ইত্যাদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ও তাঁর কবি-হৃদয়কে উদ্বেলিত করেছে, তাঁর কবিতায় গীতিময় রূপলাভ করেছে। বস্তুতঃ "কায়কোবাদের মন বিচিত্রগামী ছিল—বহু বিষয় এসে তাঁর মনে দোলা দিয়েছে। তাঁর খণ্ড কবিতায় তাই বিষয় বৈচিত্র্যের অভাব নেই।"[১০] অমিয়ধারা কাব্যেও এ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বিষয়-বৈচিত্র্যের বিচারে এ কাব্যেও কবির সার্থকতা প্রশংসনীয়।

'অশ্রুমালা' প্রসঙ্গে ডক্টর আনিসুজ্জামান বলেছেন, "লিরিক আবেগের অকৃত্রিম প্রকাশ এতে ঘটেছে, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রকাশ নৈপুণ্য।"[১১] এই 'প্রকাশ নৈপুণ্য' ও 'লিরিক আবেগ' কায়কোবাদের অমিয়ধারা কাব্যে আরও বেশী সুস্পষ্টতা ও গভীরতা লাভ করেছে। এখানে কবির অনুভূতির প্রকাশ অপূর্ব গীতরসে সমৃদ্ধ, আবেগ সংহত ও স্বাভাবিক। "বিশেষ করে আধ্যাত্মিক প্রেম-চেতনা বিষয়ক কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে গীতিসুর অপূর্ব ভক্তিরসে সঞ্জীবিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।"[১২] এই আধ্যাত্মিক-প্রেম-চেতনাই 'অমিয়ধারা' কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে।

ভক্ত-কবি কায়কোবাদের ঈশ্বরভক্তি বা অধ্যাত্ম-প্রেম-চেতনার পরিচয় অশ্রুমালা কাব্যেও প্রাপ্য। অমিয়ধারা কাব্যে এ ধরনের কবিতা-গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—জগদীশ্বর, আজান, প্রাণের বীণা, বৈতরণী নদীর তীরে, পরপারের যাত্রী, কখন আসিবে তুমি, অজানিত দেশ, চোখের ঠুলী, জীবন-সায়াহ্নে, মরণ-সঙ্গীত, ভুল, বাসর ঘর, তার দুয়ারে, সব তোমারি, আহবান, জীবন-সঙ্গীত প্রভৃতি। কাব্যের শুরুতেই কবি স্রষ্টা তথা জগদীশ্বরের পূজা করার জন্য 'ভ্রান্ত মন'কে আহবান জানিয়েছেন। প্রকৃতিরাজ্যের সবকিছুই ঈশ্বরের আরাধনায় মগ্ন। স্রষ্টা বা ঈশ্বর আমাদের প্রভু, কবি তাঁর একান্ত ভক্ত। কবির অন্তরে ঈশ্বরের অবস্থান। তাঁর প্রতি ভক্তিতে কবির অন্তর পরিপূর্ণ। কবির সে ভক্তি ও আনুগত্যের গভীরতা তুলনাহীন। ভক্ত কবির চিত্তটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। আজানের ধ্বনি শুনে ঈশ্বর-প্রেমিক কবি তাঁর আহবান অন্তরে অনুভব করেন।

তাঁর সমস্ত অন্তর নেচে ওঠে আনন্দে। মর্মে মর্মে আজানের সুমধুর সুর ধ্বনিত হয়ে তাঁকে পাগল করে তোলে—

আমি ত পাগল হ'য়ে
সে মধুর তানে
কি যে এক আকর্ষণে ছুটে যাই মুগ্ধ মনে
কি নিশিতে কি দিবসে
মসজিদের পানে।
হৃদয়ের তারে তারে, প্রাণের শোণিত ধারে
কি যে এক ঢেউ উঠে
ভক্তির তুফানে!
কত সুধা আছে সেই মধুর আজানে।
(আজান : অমিয়ধারা : পৃ. ২)

এই সহজ-সরল-অনাম্বড়র-অকপট প্রকাশে কবির হৃদয়ের ভক্তির গভীরতা উপলব্ধিতে আমাদের হৃদয়ও ভক্তিরসে প্লাবিত হয়ে যায়। কবির একান্ত অনুভূতি সর্বজনীন হয়ে ওঠে, সঞ্চারিত হয় হৃদয় থেকে হৃদয়ে। এখানেই গীতিকবি কায়কোবাদের সার্থকতা।

স্রষ্টার প্রেমে আত্মহারা কবি সারা জীবন ধ'রে শুধু তাঁর প্রভুকে খুঁজে ফিরেছেন। কবির অঙ্গীকার :

আমার হৃদয় কুঞ্জে ফুটবে কুসুম
লয়ে তাহার বাস
আমি পাগল হয়ে খুঁজব তারে
আমার প্রতি শ্বাস!
(প্রাণের বীণা : অমিয়ধারা : পৃ. ১৩)

কবি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে, স্বর্গ-মর্ত-সাগর-গিরি-মরু-গহন বনে সর্বত্র প্রভুকে খুঁজে বেড়াবেন, সেখানে না-পেলে পাতাল পুরীতেও যাবেন, স্রষ্টাকে পাওয়ার পর তাঁর প্রেম-পিপাসা মিটবে। স্রষ্টার মিলনাকাঙ্ক্ষী কবির আর্তনাদ :

জীবনে মরণে মোর প্রাণ যারে চায়,
কোথা গেলে পাব তারে, সে আজি কোথা?
কোরাণে ইঞ্জিলে বেদে লেখা পাতে পাতে
সে আছে ব্রহ্মাণ্ড যু'ড়ে প্রতি রেণু সাথে!
(জীবন সঙ্গীত : অমিয়ধারা : পৃ. ৮৯)

অথচ কবি তাঁর প্রভুকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না। সর্বত্রই তিনি তাঁকে খুঁজেছেন। কবি তাঁর প্রভুকে চেনেন না, জানেন না, শুধু ভালবাসেন। অন্তরে বাহিরে চারিধারে কবি স্রষ্টার অবস্থান উপলব্ধি করেন কিন্তু কোথাও তাঁর দেখা পান না। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত কবি উচ্চারণ করেন :

বিফলে জীবন গেল যে আমার,
তব সনে দেখা না হইল আর,
পাপের কুহকে সুপথ ছাড়িয়া
হ'য়েছি বিপথ গামী।
(কখন আসিবে তুমি : ঐ : পৃ. ৩৮)

অবশেষে সাধক কবির সাধনা সার্থক হয়, তাঁর অন্বেষণ সফল হয়, তিনি তাঁর অন্তরতম স্রষ্টার অস্তিত্ব খুঁজে পান, কবি উপলব্ধি করেন :

রূপ-রস-গন্ধে　　তাহারি বিকাশ
আলো অন্ধকারে　　তারি চিরবাস
জীবনে মরণে　　তারি অনুভূতি,
এ সৌরজগৎ　　তারে করে স্তুতি
সে আছে সবারি প্রাণের ভিতরে!
(আমি ত চিনিনে তারে : ঐ : পৃ. ৬৮)

কবি আরও উপলব্ধি করেন,

সে যে আমার প্রাণের মাঝে চুপটি করে আছে বসে
আমি বোকার মত আকুল প্রাণে খুঁজছি তারে দেশ-বিদেশে।
(তার দুয়ারে : অমিয়ধারা : পৃ. ৬৩)

আপন অন্তরে স্রষ্টার অস্তিত্ব টের পেয়ে কায়কোবাদের বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। কবি উপলব্ধি করেন তিনি পথ ভুলে গেলে কিংবা সুপথ ছেড়ে বিপথে গেলে অলক্ষ্যে থেকে স্রষ্টা তাঁকে পথ দেখান। ঘোর বিপদে তিনি যখন প্রাণভরে প্রভুকে ডাকেন, কবির ডাকে সাড়া দিয়ে প্রভু তখন চুপি চুপি ভক্তের হাত ধরেন। স্রষ্টার অসীম দানে ও দয়ায় কবি-চিত্ত কৃতজ্ঞ। এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই স্রষ্টার দান। কবি তাই আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলছেন :

যা দিয়েছ আমায় তুমি, ঋণ তো তাহার শুধতে নারি
আমি তোমার প্রেম-ভিখারী, আমার যাহা সব তোমারি।
(সব তোমারি : ঐ : পৃ. ৬৪)

কবি তাঁর পরম প্রিয় প্রভুকে কখনও ভুলে না-যাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। নিজের পাপের কথা চিন্তা করে স্রষ্টার কাছে মিনতি করছেন তাঁকে রক্ষা করার জন্য। তিনি জানেন তাঁর প্রভু ক্ষমাশীল, দয়ার ভাণ্ডার। তাই কবির বিশ্বাস, হাসরের দিন,

ক্ষমার টাকাটা দিয়ে সৃষ্টিকর্তা যিনি
কিনিয়া লইবে তব পাপের গাঁঠরি।
(হাসরের মাঠের সওদা : ঐ : পৃ. ৮২)

ঈশ্বরের প্রতি পরম বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও জীবনের শেষ লগ্নে এসে বিদায়ের বিষাদ সুরে কবির অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিদায়ের আহবানে কবির অন্তর ব্যথিত, তাঁর হৃদয়াকুতি ও ব্যাকুলতা সুন্দর-করুণ রূপে [illegible] হয়েছে অমিয়ধারা কাব্যে : কবির অন্তর থেকে পাঠকের অন্তরে ছড়িয়ে পড়েছে বিদায়ের করুণ রাগিণী। স্রষ্টার কাছে কবির আকুতি :

জীবনের আলোগুলি
একে একে নিবে গেছে।
লক্ষ্যহারা হয়ে নাথ
এসেছি তোমার কাছে।
(প্রার্থনা : অমিয়ধারা : পৃ. ৯)

পরপারের ডাক এসেছে কবির কাছে,
খেয়া নৌকায় পাল তুলিয়ে
মাঝি আমায় ডাকছে এ'সে!
আর দেরী নেই মহাযাত্রার
যেতে হবে কোন্ বিদেশে।
(পরপারের যাত্রী : ঐ : পৃ. ২৪)

পরপারের ডাকে এ জগৎ থেকে বিদায় নেবার জন্য কবি নিজেও প্রস্তুত। তবুও অতীতের স্মৃতি কবির প্রাণে আজ বিষাদের সৃষ্টি করছে। এ পৃথিবীর মায়া তিনি ত্যাগ করতে পারছেন না। মাটির পৃথিবীকে, ফুল-পাখীকে কবি বড় ভালোবাসেন, তাই কবির মনে প্রশ্ন জাগছে—

সেথাও কি এই দেশের মত
ফুল বাগানে কুসুম ভরা?
অথবা কি বিজন পুরী
চারিদিকে কানন ঘেরা?
(পরপারের যাত্রী : ঐ : পৃ. ২৫)

বিদায়ের ক্ষণে কবির অন্তর বিষাদগ্রস্ত ও বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁকে বিচলিত করে তুললেও শেষ পর্যন্ত ভক্ত কবিরই জয় হয়েছে। ভক্ত-প্রাণের ঐকান্তিক বিশ্বাসে স্রষ্টাকে পাওয়ার আনন্দে কবি মৃত্যুকে স্বীকৃতি দেন আনন্দ চিত্তে, মৃত্যুকে তিনি 'মৃত্যু' বলে মনে করেন না :

কে বলে তাহারে মৃত্যু? সে তো মোর বিয়া
যার প্রেমে ছিনু মত্ত দিবস শর্বরী!
নীরবে ঘুমিয়ে রব তারে বুকে নিয়া
নিভৃতে-নির্জ্জন গৃহে আপনা পাশরি।
(মৃত্যু : অমিয়ধারা : পৃ. ৪১)

এ 'মৃত্যু' কবির দৃষ্টিতে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের সোপান। মৃত্যু'র পরে যে কবরে কবিকে সমাহিত করা হবে তাকে তিনি বাসর ঘর হিসেবে কল্পনা করেছেন 'বাসর ঘর' শীর্ষক কবিতায়। কবিতাটিতে ভক্ত-

কবির কল্পনার একটি অন্তরঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে। মৃত্যু'র মাধ্যমে কবিকে যেন বিয়ের পর বাসর ঘরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে চারিদিকে, যেখানে প্রভুর সঙ্গে তাঁর প্রথম মিলন হবে। কেউবা সুগন্ধি দিয়ে কবিকে স্নান করাচ্ছে, পাড়া-পড়শীরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে, কেউ আতর-লোবান-গোলাপ আনছে, কেউবা কবর রূপ বাসর ঘর তৈরীতে ব্যস্ত, কেউ দোলা তৈরী করছে যাতে চড়ে কবি যাবেন। কেউ নতুন কাপড়ে কবিকে সাজিয়ে দিচ্ছে, সমস্ত আয়োজন শেষে—

বরযাত্রীরা পাছে পাছে যাচ্ছে দলে দলে
এমন সুখের শুভযাত্রা বহু পুণ্যের ফলে।
পুরোহিত মোল্লা কাজী কত মন্ত্র পড়ে
পুষ্প দোলায় চ'ড়ে আমি যাচ্ছি বাসর ঘরে।

(বাসর ঘর : ঐ : পৃ. ৬০)

কবিতাটিতে ভক্ত-কবির ভক্তি-বিগলিত-চিত্তের, হৃদয়ের একনিষ্ঠতার সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে। 'অশ্রুমালা' কাব্যে আমরা কবির উপলব্ধির কথা, নানা জিজ্ঞাসা ও বিশ্বাসের কথা পেয়েছি, ভাব-তন্ময়তার রূপ দেখেছি কিন্তু এমন পরম নির্ভরতা ও গভীরতর অনুভবের রূপ দেখিনি। এ কাব্যে ঈশ্বর-ভক্ত কবির, প্রেমিক-কবির রূপটি গভীরতর প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত, সুন্দর ও সংহত।

অধ্যাত্ম-চিন্তা-চেতনার অনুষঙ্গী কিছু কবিতা কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। 'অমিয়ধারা' কাব্যেও কয়েকটি কবিতা পাই যেখানে এ কবি পৃথিবী ও জীবনের স্থায়িত্বহীনতার কথা বলেছেন, মানুষকে তার সত্তার ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ক'রে দিয়েছেন, ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে বলেছেন, পরের দুঃখে সমব্যথী হতে বলেছেন। এ ধরনের কবিতার মধ্যে ধনী ও দরিদ্র, ধনীর প্রতি, ফুলের হাসি, সুখ, কেউ ত কারুর নয়, মানব জীবন তব এই আছে এই নাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'ফুলের হাসি' কবিতায় কবি রূপকের মাধ্যমে মানুষের জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ফুল যখন ফোটে তখন তার সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ হয়, নিজেদের কাজে লাগায়, কিন্তু বাসি হয়ে ঝরে যাওয়ার পর ফুলের

সমাদর থাকে না। জগতেও এ ধারা চলছে এখানে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তবুও সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কবি লক্ষ্য করছেন :

ছলনা চাতুরী ভিন্ন কিছু আর নাহি ভবে,
কার ধন কেবা নিবে এই কথা ভাবে সবে।
(কেউ ত কাহার নয় : অমিয়ধারা : পৃ. ৯৭)

এ পৃথিবীতে সবাই সুখের অন্বেষায় ছুটছে। কিন্তু কবি বলছেন ধন-রত্ন কোন কিছুতেই সুখ নেই, প্রকৃত সুখ রয়েছে পরোপকারে। কবির মতে, নিজের সুখ ভুলে গিয়ে পরের কথা ভাবলে, পরের দুঃখ-কষ্ট দূর করলে, আপনাকে দীন-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিলে আত্মায় সুখ পাওয়া যায়। তিনি ধনীদের সাবধান করে বলছেন, তাদের ধন-ঐশ্বর্য সবকিছুই পৃথিবীতে পড়ে থাকবে, একদিন শূন্যহাতেই সবাইকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ-ই যখন বিধির বিধান তখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে নিজেদের পাপের বোঝা বাড়ে। জীবনের পরিণাম উপলব্ধি করেই কবি মানুষকে আহবান জানিয়েছেন :

ধর্ম কর্ম সদা করি　　পাপ কর্ম পরিহরি
বিধাতার　আশীর্বাদ
লহ শিরপর।
(কওসর : অমিয়ধারা : পৃ. ১১)

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির এ জাতীয় ভাবনা মূলতঃ তাঁর অধ্যাত্ম-চিন্তা-ধারারই অন্যরূপ। ঈশ্বরভক্ত কবি জগৎ এবং জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই মানুষকে তাদের পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছেন। ব্যক্তিক-অনুভূতি ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন।

তিন

কায়কোবাদ মূলতঃই একজন প্রেমিক কবি। এ প্রেম কখনও ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে, কখনও বা মর্তলোকের প্রিয়া তাঁর হৃদয়ানুভূতিকে আলোড়িত করেছে। অধ্যাত্ম-প্রেম জাতীয় কবিতার পাশাপাশি তাই

নারীর প্রেমে ব্যাকুলবিরহ-বেদনামূলক কবতিাও 'অমিয়ধারা' কাব্যে স্থান পেয়েছে। ঈশ্বর প্রেমে যেমন ভক্ত-কবির নিবেদিত-প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, নারীর প্রেমেও তেমনি তাঁর একনিষ্ঠতার প্রকাশ রয়েছে। এ দু'টিতে কখনও বিরোধ বা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। তার কারণ কবি যখন যে ভাবকে নিয়ে বিভোর হয়েছেন, তাতেই প্রাণ-মন সবই সমর্পণ করেছেন। আর এ কারণেই তাঁর কবিতা অন্তরঙ্গ গীতিময়তা লাভ করতে পেয়েছে, ব্যক্তি অনুভূতি সর্বজনীন হয়ে উঠতে পেরেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই।

অমিয়ধারা কাব্যের মূল সুর অধ্যাত্ম-প্রেম বলে এ কাব্যে অধ্যাত্ম-প্রেমের কবিতাই প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর প্রেমে কাতর ও বিরহী-প্রেমিক কবির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে কয়েকটি কবিতায়। বলা বাহুল্য, অমিয়ধারা কাব্যের প্রেমের কবিতায়ও কবি প্রেমে বিরহী, হতাশ ও ব্যর্থ। এখানেও কবি প্রিয়ার সৌন্দর্যে মুগ্ধ, বিরহে ব্যাকুল, প্রিয়াকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত, সন্দেহে-আশংকায়-অভিমানে তাঁর চিত্ত যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত। 'অশ্রুমালা' কাব্যের প্রেম-ভাবনার বৈশিষ্ট্যই অমিয়ধারা কাব্যে বিস্তৃত। কিন্তু এ কাব্যে পূর্বের সেই তীব্র আবেগ ও উচ্ছ্বাসের গভীরতা নেই। এখানে কবি অনেক বেশী শান্ত ও স্থির :

শরীরে যার গোলাপ গন্ধ
মদিরাময় আঁখি !
দেখলে যারে মনে লয়
হৃদে ভরে রাখি !
দেবী কি মানবী পরী
অথবা স্বর্গের হুরী
প্রেমের মন্দিরে সে যে
মানস-প্রতিমা ।
(শিশিরবিন্দু : অমিয়ধারা : পৃ. ৭১)

এই যে 'মানস-প্রতিমা' যাকে দেবী মানবী বা স্বর্গের অপ্সরা বলে ভুল হয় সে-ই কবির প্রিয়া যার সৌন্দর্যে মুনি-ঋষিও পাগল হয়। প্রিয়া-বিরহে-কাতর কবি প্রিয়াকে খুঁজে বেড়ান সর্বত্র। চারপাশে যা

কিছু দেখছেন সবকিছুতেই আপন প্রিয়ার অস্তিত্ব অনুভব করছেন। তাই তিনি প্রিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন :

তোমার চোখের অশ্রুগুলি
দেখি আমি তৃণের কোলে
কেহই তাহা চিনতে নারে
সবাই নিশির শিশির বলে।
(তুমি এখন র'লে কই : অমিয়ধারা : পৃ. ২৯)

প্রিয়াকে খুঁজে খুঁজে কোথাও তার দেখা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত কবির মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, না জানি কবি-প্রিয়া কার গৃহিণী হয়ে আছে—

আর কতদিন এমনি ভাবে খুঁজব তারে দিন যামিনী
কে কবে সে কোথায় আছে ? জানি নে সে কার গৃহিণী ?
(কার গৃহিণী : অমিয়ধারা : পৃ. ৩৫)

কবির এ আশংকা একান্ত মানবীয়। প্রিয়া-অন্বেষণ, প্রিয়া-দর্শনের জন্য প্রতীক্ষা ও ব্যাকুলতা, প্রিয়ার সৌন্দর্য, বিরহ-অভিমান-সন্দেহ ইত্যাদি বিচিত্র অভিব্যক্তিতে কায়কোবাদের প্রেমভাবনা বিলসিত। তবে এ কাব্যে প্রেমের কবিতার সংখ্যা খুব কম। এ প্রসঙ্গে কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কবি নিজেই বলেছেন, "পার্থিব প্রেমের কবিতাগুলি এই কবিতা হইতে উঠাইয়া চতুর্থ সংস্করণের "অশ্রুমালা" ও "প্রেমের ফুল" কাব্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি।"[১৪] প্রকৃতপক্ষে অমিয়ধারা কাব্যে অধ্যাত্ম-প্রেম-ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই কবি নিজেই পার্থিব প্রেম বা নারীর প্রেমভাবনামূলক কবিতাগুলোকে 'অশ্রুমালা' ও 'প্রেমের ফুল' কাব্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন—যেখানে পার্থিব প্রেমই কাব্যের মূল সুর।

প্রকৃতি প্রেম কায়কোবাদের সহজাত প্রবৃত্তি। 'অশ্রুমালা' কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়, 'অমিয়ধারা' কাব্যে তাঁর প্রকৃতি-প্রীতির পরিচয় সমভাবে লক্ষণীয়। তবে পার্থিব প্রেমের মতো প্রকৃতিও এ কাব্যে তেমন প্রাধান্য পায়নি, গৌণভাবে এসেছে, কবির সহজাত-প্রবণতা-বশতঃই। কবি তাঁর কবিতায় যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই প্রকৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর অধ্যাত্ম-প্রেমের কবিতাতেও আমরা

প্রকৃতির বর্ণনা পাই। কখনও অধ্যাত্ম-প্রেমের প্রকাশে প্রকৃতি বাহন হয়ে এসেছে, কখনও বা প্রকৃতিতেও কবি অধ্যাত্ম-প্রেমের নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন। কবি শুধু নিজেই নন, প্রকৃতি রাজ্যের সবাই যেন স্রষ্টার প্রেমে মগ্ন :

তারি গুণ গান গাইছে সকলে
দেবতা মানব পাখী।

কিংবা,

উষা ফুলেশ্বরী ফুল ভূষা পরি
এ সুখ সময়ে আসি!
পূজিছে তাহারে হৃদি-পুষ্প হারে
মুখেতে মধুর হাসি!
(জগদীশ্বর : অমিয়ধারা : পৃ. ১)

'ফুলের হাসি' কবিতাতে কবি ফুলকে কেন্দ্র করে জীবনের একটি পরম সত্যকে রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। জীবনের গভীরতর উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্য তিনি প্রকৃতিতে হাত বাড়িয়েছেন। প্রিয়ার রূপ বর্ণনা করার জন্য তিনি প্রকৃতি থেকে উপাদান নিয়েছেন, প্রকৃতিতে প্রিয়ার অস্তিত্ব খুঁজে বেরিয়েছেন। 'শিশির বিন্দু'কে প্রশ্ন করছেন :

তার নয়নের অশ্রু কি তুই?
ওরে শিশির কণা?
(শিশির বিন্দু : অমিয়ধারা : পৃ. ৭০)

অন্যত্র বলছেন,

পাতায় পাতায় শিশির দোলে
আমি ভাবি তার অশ্রু কণা!
(অপরিচিত প্রেমিক : অমিয়ধারা : পৃ. ৫০)

গোধূলি, শশধর, মেদিনী, আমাদের গ্রাম, চোখ গেল, আমার পল্লীখানি প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। বিভিন্ন ফুলের নাম

ও প্রসঙ্গ বার বার এসেছে তাঁর কবিতায়। এভাবে কবি বারে বারে প্রকৃতিতে দৃষ্টি দিয়েছেন। 'বসন্ত' কবিতায় কবি 'বসন্তে'র আগমনের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন :

সুখের বসন্ত এল ধরণীর পরে,
ফুটিল কুসুমগুলি থরে থরে থরে।
গোলাব চামেলী বেলী মতিয়া টগর
মল্লিকা মালতী জুঁই চাঁপা মনোহর।
সবাই ফুটিল এবে মলয় পবনে,
কত জাতি পাখী গায় কাননে কাননে।
(বসন্ত : অমিয়ধারা : পৃ. ৮০)

কায়কোবাদের প্রকৃতি-প্রীতি এত বেশী তীব্র ছিল যে, অধ্যাত্ম-প্রেমে বিভোর কবি পরপারে যাওয়ার কালেও এ মাটির পৃথিবীকে ভুলতে পারেন না, তার মায়া ত্যাগ করতে পারেন না। বরং কবির মনে প্রশ্ন জাগে এ পৃথিবী ছেড়ে মৃত্যুর পর যে দেশে যাবেন কবি সেখানেও এই দেশের মত 'ফুল বাগানে কুসুম ভরা' 'চারিদিকে কানন ঘেরা' আছে কিনা। কবির মনে প্রশ্ন জাগে----

সেথাও কি ঐ নীল আকাশে
রবি শশী করে খেলা ?
তৃণের কোলে মুক্তা দোলে
নিশি শেষে ভোরের বেলা ?
বর্ষাকালে বাদল ঝরে
ডাহুক ডাকে বিলের মাঝে ?
হাস্‌না-হেনার গন্ধ এসে
আকুল করে নীরব সাঁঝে ?
(পরপারের যাত্রী : ঐ : পৃ. ২৫)

চার

কায়কোবাদের গীতিকবিতায় বিষয়বৈচিত্র্যের কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। বাস্তবিকই, "'''কায়কোবাদের মনোভঙ্গীতে ছিল এক

আশ্চর্য বৈচিত্র্য, যা কবিকে গীতিচিন্তায়, বিচিত্র স্বাদের পথে পরিচালিত করেছে।"[১৫] এই মনোভাবেরও আরও পরিচয় পাওয়া যায় 'অমিয়-ধারা' কাব্যে কবির মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর-দরদ-প্রকাশ-ধর্মী কয়েকটি কবিতায়। কবি নিজের দেশ ও নিজের ভাষাকে যে কত ভালবাসতেন এ সমস্ত কবিতায় তাঁর সে অনুভূতির পরিচয় সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মায়ের ডালা, আমার পল্লীখানি, দেশের বাণী, বঙ্গভাষার কাব্যকুঞ্জ, বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা, বাংলা আমার, আমাদের গ্রাম প্রভৃতি কবিতার নামকরণেই তাঁর সে হৃদয়াবেগের প্রকাশ ঘটেছে। 'মায়ের ডালা' কবিতায় কবি সমস্ত 'বঙ্গবাসি'কে আহবান জানিয়েছেন 'সাহিত্যের কুঞ্জবনে' এসে 'কবিত্বের' 'ফুল-রতনে' মালা গেঁথে মা-রূপ বঙ্গভাষার গলায় গেঁথে দেয়ার জন্য। কবি 'বাঙ্গলা'কে "মা" বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি গর্ব করে বলছেন :

বাঙ্গলা মোদের মাতৃভাষা
কি আছে তাহার মত
শব্দে ছন্দে মুক্তো ঝরে
জাগায় প্রাণে স্বপ্ন কত!
উর্দু বল পার্সি বল
সব ভাষা মোর মায়ের পাছে!
আমার মায়ের মত এতই মধুর
কোন্ ভাষা আর ধরায় আছে।

(মায়ের ডালা : অমিয়ধারা : পৃ. ১০৪)

অন্যত্র বলেছেন,

এসেছি আমরা মায়ের প্রাঙ্গণে ভাই ভাই মিলি হিন্দু-মুসলমান
গাইতে মোদের জনম ভূমির মাতৃভাষার মঙ্গল গান।
... ...
আলায়ল কবি দৌলত কাজী জয়দেব আর কবিকঙ্কণ
গেঁথে ফুল মালা সাজাইয়া ডালা তুষিল আমার মায়ের মন।

(বঙ্গভাষার কাব্যকুঞ্জ : ঐ : পৃ. ১১৯)

কায়কোবাদ শুধু 'মাতৃভাষা'কেই মায়ের মর্যাদা দেন নি, তিনি মাতৃ-ভূমিকেও সমমর্যাদায় ভূষিত করেছেন। 'মাতৃভাষা' ও 'মাতৃভূমি' দু'টিই

তাঁর কাছে 'মায়ের' সম্মান পেয়েছে ; দু'টি নিয়েই তিনি সমানভাবে গর্বিত। মাতৃভাষাকে তিনি যেমন গভীরভাবে ভালবাসতেন মাতৃভূমিকেও তিনি তেমনি ভালবাসতেন। পরাধীনতার জ্বালা তাঁর মনে তীব্র বেদনার সৃষ্টি করেছে,—

পরাধীন জাতি মোরা
হাত ভাঙ্গা পাও খোঁড়া
হাঁটিতে শকতি নাই—কেমনে বা চলি।
(দেশের বাণী : অমিয়ধারা : পৃ. ১১৮)

অন্যত্র,

আমরা ভিক্ষুক জাতি　　বেশ ভূষা গুঁতা-লাথি
স'য়ে স'য়ে ফেটেছে উদর।
জানিনে সুখের লেশ　　সহি কত ক্ষুধা ক্লেশ
পরের পাদুকা বহি
শিরের উপর।
(কওসর : অমিয়ধারা : পৃ. ১০)

পরাধীনতার গ্লানি যে কত মর্মান্তিক তা তিনি যে বুঝতে পেরেছিলেন এ সব উক্তি তারই পরিচয়বাহী। নিজের জাতির জন্যে কায়কোবাদের ছিল গভীর ভালবাসা ও সহানুভূতি। দেশ ও জাতির দুর্দশার কথা ভেবে তিনি ব্যথিত, ক্ষুব্ধ। এ দেশের লোক শুধু বিলাস-ব্যসনে রত, দেশের দুঃখ তাদের বোধগম্য নয়, এ দেশের ধান চাল সব বিদেশে চলে যায়, দেশ ভিক্ষুকের বেশে পড়ে থাকে---এসব কথা তিনি 'দেশের বাণী' কবিতায় বলেছেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের দুঃখে ব্যথিত কবি আরও বলছেন, যারা চাষা তারা মহাজনের অত্যাচারে ছেলেমেয়ে ও পরিবার নিয়ে দুঃখকষ্ট করছে। অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে কবির অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দেশের মানুষ বিদেশী বস্ত্রের প্রতি বেশী আকৃষ্ট বলে তাঁতী জোলারা অনাহারে মারা যায়। কবি আরও লক্ষ্য করেছেন :

দেশের ভূস্বামী যারা
যমদূত প্রায় তারা
সতত শোষণ করে শোণিত প্রজার।
(দেশের বাণী : অমিয়ধারা : পৃ. ১১৬)

কবিতাটিতে কবির দেশোত্ত্ববোধ সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অত্যাচারে-অবিচারে সারা দেশ ছেয়ে গেছে, দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য কেউ ভাবছে না দেখে কবির অন্তর হাহাকার করে ওঠে। কবি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করতে পেরে এবং বঙ্গভাষাকে মাতৃভাষা রূপে পেয়ে। কবির মতে :

> আমরা বাঙ্গালী কি আছে জগতে আমাদের এই দেশের মত ইন্দ্রের অমরা তুচ্ছ এর কাছে সৌন্দর্য তাহার নাহিক তত! বাঙ্গালী বলিয়া দিতে পরিচয় গর্বে মোদের হৃদয় নাচে আমাদের মাতৃ ভকত জগতের মাঝে কে আর আছে।
> (বঙ্গভাষার কাব্যকুঞ্জ : ঐ : পৃ. ১১৯)

একই আবেগে অন্যত্র বলেছেন,

হৃদয় আমার বাংলা লাগি
যে দেশেই থাকি সদা থাকে জাগি
স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ সে আমার
বাংলা আমার অমিয়-ধারা।
(বাংলা আমার : ঐ : পৃ. ১৩৮)

এই মাতৃভূমি বাংলার গাছ-পালা, ফল-মূল, মাঠ-ঘাট, নদী-পাখী, কুলি-চাষী সবকিছুকে, সবাইকে কবি সমানভাবে ভালোবেসেছেন। যেখানেই বাঙ্গালী আছে প্রাণের আবেগে কবি সেখানে ছুটে যান। বাংলার কাব্য, বাংলার ভাষা কবির প্রাণের পিপাসা মেটায়, যে দেশে বাঙ্গালী নেই সে দেশ কবির আপন নয়। কবির প্রতিজ্ঞা,

বাঙ্গালীর সনে মিশি প্রাণে প্রাণে
থাকিব সতত জীবনে মরণে

বাঙ্গালী আমার আপন জন
বাঙ্গালী আমার ভাই !
(বাংলা আমার : অমিয়ধারা : পৃ. ১৩৯)

কবির এই দেশপ্রেম ও মাতৃভাষাপ্রীতি 'অমিয়ধারা' কাব্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা 'অশ্রুমালা' কাব্যে তত গভীরভাবে পাওয়া যায় না। 'আমাদের গ্রাম' ও 'আমার পল্লীখানি' কবিতা দু'টিতেও কবির জন্মভূমি-প্রীতির আন্তরিকতা উপলব্ধি করা যায়।

পাঁচ

'অমিয়ধারা' কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রায় সবগুলো কবিতা এবং প্রথম খণ্ডেও দু'একটি কবিতা রয়েছে যেখানে কবি মুসলমানদের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদের আহবান জানিয়েছেন। স্ব-জাতির দুর্দশা দেখে সে যুগের অন্যান্য কবি সাহিত্যিকের মতো কায়কোবাদের অন্তরও হয়েছিল বিচলিত। জাতীয় জাগরণের উদ্দেশ্যে তিনি মুসলমানদের অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে আহবান জানিয়েছেন। এ আহবান 'অশ্রুমালা' কাব্যেও শোনা যায়। তবে 'অশ্রুমালা'রে জাতীয় জাগরণমূলক কবিতাতে কবির আক্ষেপ ও হতাশার অসহায় সুরই ধ্বনিত হতে দেখা যায়, 'অমিয়ধারা'তে তার প্রকাশ আরও সোচ্চার, দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। "অশ্রু-মালার ঐতিহ্য চেতনামূলক কবিতাতে কবির কান্না শুনেছি, 'অমিয়-ধারা'তে কান্নার বিন্দুগুলো অনেকটা যেন আগুনের ফুলকির মতো ছুটে বেরিয়েছে।"[১৬] এখানে কবির আবেগ অনেক তীব্র ও গতিশীল।

উত্থান সঙ্গীত, ঈদ-আবাহন, আল্-এসলাম, মোস্লেমের জাতীয়-গৌরব, তুমি কি ঘুমায়ে শুধু রবে, ইসলাম, কবির প্রথম আহবান, মহরমের চন্দ্র, অতীতের স্বপ্ন, ঈশ্লামের ডঙ্কা, কবির চাবুক প্রভৃতি কবিতায় তিনি মুসলিমদের জাগাবার জন্যে তাদের অতীত গৌরবের দিকে ফিরে তাকাবার জন্যে আহবান জানিয়েছেন। কবির আক্ষেপ, যে জাতি একদিন উন্নতির শীর্ষদেশে ছিল আজ কেন তাদের এ দুর্দশা, কোন্ পাপে মুসলমানরা আজ অভিশপ্ত! কবি মুসলমানদের এ দুর্দশার

জন্য তাদেরই দায়ী করেছেন। কবির মতে, তারা ঐশ্বর্যের মোহে পড়ে কর্তব্য কাজ ভুলে গেছে, স্ব-জাতি প্রেম ভুলে গিয়ে বিষয়-বৈভবে ডুবে আছে, তাই আজ অতীতের সব গৌরব হারিয়েছে। কবি তাদের উদ্দেশ্যে বলছেন :

জাগরে মোস্লেম জাগ
আর কত ঘুমে রবে!
সবাই জাগিল বিশ্বে
তোমরা জাগিবে কবে?
(উত্থান সঙ্গীত : অমিয়ধারা : পৃ. ১৪৩)

'ঈদ আবাহন' কবিতায় কবি অতীতের অন্ধকারে যা হারিয়ে গেছে তা খুঁজে নেয়ার জন্য মুসলমানদের আহবান জানিয়েছেন। মুসলমানদের দুর্দশা দেখে কবির হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত, কিন্তু স্ব-জাতির নির্জীব ভাব কবির হৃদয়ে গ্লানির সৃষ্টি করে। তিনি কখনও তাদের নিন্দা করেছেন, কখনও ধিক্কার দিয়েছেন, ভৎর্সনা করেছেন, কখনও বা অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, নতুন উদ্যম নিয়ে জেগে ওঠার জন্যে আহবান জানিয়েছেন। স্ব-জাতির প্রতি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কবি বলেছেন :

আর কত দিন রবে পশ্চাতে পড়িয়া
আর কতদিন ভবে,
এভাবে লাঞ্ছিত হবে,
পরের পাদুকা ল'বে মাথায় তুলিয়া
ছড়ায়ে প্রতিভা রাশি
হাসিয়া গৌরব হাসি
হা মোস্লেম, কবে তুমি উঠিবে জাগিয়া?
(ঈদ আবাহন : ঐ : পৃ. ১৪৯)

কবি আরও বলেছেন,

কবির তপস্যা পূর্ণ চিরতরে সেই দিন হবে,
ঘুমন্ত মোস্লেম জাতি জাগিয়া উঠিবে পুনঃ যবে।
(আল্ এসলাম : অমিয়ধারা : পৃ. ১৫৪)

মুসলমানদের গৌরব-গাথা কবি কিছুতেই ভুলতে পারেন না। তাঁদের অতীত-গৌরব-স্মৃতি কবির প্রাণে গভীর ব্যথার সৃষ্টি করে। কবির আক্ষেপ, যাঁরা একদিন মুসলমানদের ঐতিহ্য ও গৌরব বৃদ্ধি করে-ছিল তারা আজ কেউই নেই, কে এখন ইসলামকে দেখবে। আজ শুধু ইসলাম নামটিই বেঁচে আছে, তার উপযুক্ত ধারক ও বাহক নেই। এ দুঃখ কবি কিছুতেই ভুলতে পারেন না। অসহায় কবি তাই আজ শুধু স্মৃতিচারণ করেন আর স্ব-জাতিকে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে চান জাতির গৌরব বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়ার জন্য। স্ব-জাতির লজ্জায় কবি কাতর, তাদের অপমান-গ্লানি কবির নিজের বুকে বড় হয়ে দেখা দেয়। তিনি তাই বার বার মুসলমানদের ধিক্কার দিয়েছেন, তাদের বীরত্বের কথা স্মরণ করে, ত্যাগ ও মহিমার কথা স্মরণ করে কবি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলেছেন। স্ব-জাতিকে জেগে উঠার জন্য তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন, ধিক্কার দিয়েছেন, বর্তমান অধঃপতনের জন্যে কবি তাদেরই দায়ী করেছেন, শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেই ক্ষান্ত হননি, জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছেন। এ কাব্যে তাই কবির স্ব-জাতি-ভাবনা অনেক বেশী স্পষ্ট, গভীর-চেতনা-লব্ধ বলিষ্ঠ উচ্চারণে সমৃদ্ধ।

অমিয়ধারা কাব্যের জাতীয়-জাগরণমূলক কবিতাতে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কথা বলতে গিয়ে কায়কোবাদ মাঝে মাঝে হিন্দুদের দোষা-রোপ করেছেন, কবির প্রথম আহবান, কবির দ্বিতীয় আহবান, আগে যাও ভাই প্রভৃতি কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ কাব্যে আমরা এমন কিছু কবিতাও পাই যেখানে কবি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি কামনা করেছেন। ভারতের জাতি-ভেদ-প্রথা, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি কবিতায় দেখা যায় যে কবি জাতি ভেদে বিশ্বাসী নন। হিন্দু-মুসলমান ভারতের এক জাতি, বিধাতা হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ করে সৃষ্টি করেন নি। তাই কবি ভাইয়ে ভাইয়ে হিংসা-কলহ করতে নিষেধ করেছেন, একে অপরের ভাই হয়ে জাতিভেদ দূর করে মিলে মিশে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান দুই ভাই যদি এক হয়ে কাজ করে তবেই দুঃখিনী ভারতের উত্থান হবে, তাদের দুঃখ-দৈন্য ঘুচে যাবে বলে কবির বিশ্বাস। কবি তাই সবাইকে আহবান করেছেন,

এস ভাই হিন্দু এস মুসলমান
আমরা দু'ভাই ভারত সন্তান
এস আজি সবে হয়ে একপ্রাণ
সেবি গে মায়ের চরণ দু'টি।
(হিন্দু-মুসলমান : অমিয়ধারা : পৃ. ১৭৩)

এ আহবানের পেছনে কবির যুক্তি :

এক বঙ্গ ভাষা আমাদের বুলি
মা ও যে মোদের একই জন।
(হিন্দু-মুসলমান : ঐ : পৃ. ১৭৭)

অমিয়ধারা কাব্যে এমন কিছু কবিতা অন্তর্ভুক্ত যেগুলোকে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। রমণী, পথিক, আমি গরীব বাপের ছেলে, সজ্জন ও কুজন, কলির অদ্ভুত জীব, কায়কোবাদের স্মৃতি লিপি প্রভৃতি কবিতা বিবিধ পর্যায়ে পড়ে। 'রমণী' কবিতায় কবি নারীর বিভিন্ন রূপের কথা বলেছেন। 'কলির-অদ্ভুত-জীব' কবিতায় তিনি সে যুগের ইয়ংবেঙ্গলদের ব্যঙ্গ করেছেন। 'কায়কোবাদের স্মৃতি-লিপি' কবিতায় তিনি মধুসূদনের অনুকরণে নিজের সমাধি ফলকে উৎকীর্ণ করার জন্য নিজের পরিচয় দিয়ে শেষে বলেছেন :

কে যাও পথিক? দাঁড়িয়ে কিছু
কর আশীর্বাদ
ঘুমিয়ে রয়েছে হেথা
কবি কায়কোবাদ।
(কায়কোবাদের স্মৃতিলিপি : অমিয়ধারা : পৃ. ২৬৪)

অমিয়ধারা কাব্যে বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে গীতিকবি কায়কোবাদের 'মানস-চেতনার দিগন্ত'[১৭] দেখে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। কবির অনুভূতির যে বৈচিত্র্য তা আমাদের মুগ্ধ করে।

ছয়

কায়কোবাদের গীতিকবিতার পরবর্তী সংকলন 'প্রেমের ফুল' কাব্য। কাব্যটি কবির শেষ বয়সের রচনা। কবির মৃত্যুর পর কাব্যটি প্রথম

প্রকাশিত হয় (১৯৪৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০)[১৮]। 'প্রেমের ফুল' কাব্যের মুখ্য বিষয় প্রেম। এ কাব্যে আধ্যাত্মিক প্রেমের কয়েকটি কবিতা রয়েছে যদিও, তবে অধিকাংশ কবিতাই পার্থিব প্রেম-বিষয়ক। 'প্রেমের ফুল' কাব্য সম্পর্কে কাব্যের ভূমিকায় কবি নিজেই বলেছেন, "প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য এই হার গেঁথেছি,···। বিচ্ছেদের দারুণ উত্তাপে আমার এই কোমল হৃদয়খানি নীরব মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। আমি সেই শুষ্ক নীরস মরুভূমিতেই এই কুঞ্জ তৈরী করিয়া বস্রার সুগন্ধি গোলাব ফুল ফুটাইতে চেষ্টা ক'রেছি।"[১৯] এ কাব্যের মূল সুর যে প্রেম-বিরহ তা কবির বক্তব্যেই সুস্পষ্ট। আমরা জানি, কায়কোবাদ প্রেমিক কবি। প্রেম সম্পর্কে কবির ধারণা : "প্রেম বিধাতার অমূল্য দান—'প্রেম' স্বর্গের পবিত্র জিনিস—'প্রেম' হৃদয়ের জ্যোতিঃ—পারিজাত কুসুম, জগতে তাহার তুলনা নেই।"[২০]

'প্রেমের ফুল' কাব্যের শুরুতে আমরা 'সঙ্গীত', 'কায়কোবাদের জীবন সঙ্গীত,' 'উৎসর্গ,' 'কায়কোবাদ প্রশস্তি' নামে চারটি কবিতা পাই। কাব্যান্তর্গত কবিতাগুলোকে কবি দু'পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে আধ্যাত্মিক-প্রেম বিষয়ক আটটি কবিতা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পার্থিব প্রেম-বিষয়ক চুয়ান্নটি কবিতা রয়েছে। আধ্যাত্মিক প্রেমের কবিতা-গুলোতে 'অমিয়ধারা' কাব্যের আধ্যাত্মিক প্রেমেরই অনুকরণ রয়েছে। এখানেও ভক্ত কবির ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। স্রষ্টার সঙ্গে মিলনা-কাঙ্ক্ষায় কবি ব্যাকুল। কবি পূর্বের মতই তাঁর প্রভুকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন এবং প্রভুর দেখা না পেয়ে আক্ষেপ করছেন :

তারি স্মৃতি প্রাণে আমার
　　জেগে আছে দিবা রাতি!
সে কি আর আসবে না হেথা
　　দিতে আমার ঘরে বাতি!
(প্রেমের মাজার : প্রেমের ফুল : পৃ. ৯)

স্রষ্টার অস্তিত্ব কবির প্রাণে সর্বদা বিরাজমান। তারি ধ্যানে কবি পাগল-পারা। বস্তুতঃ 'প্রেমের ফুল' কাব্যের আধ্যাত্মিক-প্রেম-বিষয়ক কবিতায় 'অমিয়ধারা' কাব্যেরই সুর ধ্বনিত হয়েছে। স্রষ্টার প্রেমে এখানেও কবি বিভোর, আত্মহারা।

'প্রেমের ফুল' কাব্যে পার্থিব প্রেম বিষয়ক কবিতাতেও কবির পূর্ব-প্রেমেরই অনুরণন শোনা যায়। 'অশ্রুমালা'র প্রেমের অনুভূতিই নতুন-ভাবে এখানে প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিটি কবিতাতেই পূর্বের সেই ব্যর্থতা, বিরহ-কাতরতা, মান-অভিমান ও স্মৃতি-রোমন্থনের পরিচয় রয়েছে। কবির প্রেম-ভাবনার যে বৈশিষ্ট্য আমরা পূর্ববর্তী কাব্যে দেখেছি তারই গভীরতর রূপ 'প্রেমের ফুল' কাব্যে উপলব্ধি করি।

কায়কোবাদের প্রেম-চেতনা রূপজ। প্রিয়ার রূপ বা সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করে। প্রিয়ার রূপের পরিচয় তুলে ধরতে কবি সর্বদা আগ্রহী। প্রিয়ার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েই কবি তাকে ভালবাসেন। কবি তার প্রিয়াকে বলেন :

তোমারি তুলনা তুমি প্রেয়সি আমার
জ্যোছনা বিধৌতরূপ ফুল্ল কুসুমের স্তূপ
কে আছে ধরণী মাঝে তুলনা তোমার।
তোমার মুখের শোভা মুনি-জন-মনো-লোভা
কণ্ঠে তব বীণা-ধ্বনি-কোকিল ঝংকার।
(প্রেয়সি আমার : প্রেমের ফুল : পৃ. ১২০)

আপন প্রিয়াকে কবি ফুল দিয়ে সাজাতে ভালবাসেন। সাজাই তোরে কুসুম তুলে, ফুলের মালা, মানিনী, আধফোটা ফুল প্রভৃতি কবিতায় কবি তাঁর প্রিয়াকে ফুল দিয়ে সাজাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আহবান জানিয়েছেন—

আয়লো আমার ফুলের রাণি
সাজাই তোরে কুসুম তুলে!
প্রেম-পারিজাত দিব রাণি
তোর অই অলকার চুলে।
(সাজাই তোরে কুসুম তুলে : ঐ : পৃ. ৭৫)

অন্যত্র,

এনেছি ফুল জুই চামেলী
বকুল বেলী গাঁথতে মালা!

পরিয়ে দিব কণ্ঠে লো তোর
সাজিয়ে দিব প্রেমের ডালা!
(মানিনী : ঐ : পৃ. ১২২)

কায়কোবাদের প্রেম ব্যক্তিগত-ঘটনা-নির্ভর। 'প্রেমের ফুল' কাব্যে কবি নিজেই তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'প্রেমের ফুল' কাব্যের ভূমিকাতে কবি 'অশ্রুমালা' কাব্যের 'ভুল' কবিতাটি তুলে দিয়ে বলেছেন, "এই কবিতাতে আপনারা "গিরিবালা দেবী" নাম্নী একটি বালিকার নাম পাইবেন। ইঁহার বয়স যখন ত্রয়োদশ বৎসর সেই সময় এই বালিকাটি আমার প্রথম কাব্য 'বিরহ-বিলাপ' পাঠ করে নিতান্ত মুগ্ধ হয়েছিল, এবং তাহার সম্পর্কিত একটি ভ্রাতার দ্বারা আমাকে তাহাদের বাসায় ডেকে নিয়েছিল।'''তার সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালবাসা দর্শনে আমার হৃদয়েও একটু স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহাতেই আমার এই কবিত্ব শক্তির উন্মেষ এবং উপরের লিখিত ঐ কবিতাটির জন্ম।"[২২]

শুধু একটি মাত্র কবিতাই নয়, কায়কোবাদের প্রেমের কবিতার অধিকাংশই গিরবালা দেবীর প্রেম, বিরহ ও তার স্মৃতি নিয়ে রচিত। প্রেমের ফুল, শৈশব স্মৃতি, ফুলের রাণী, একদিনের ভুল, আমারি তা ভুল প্রভৃতি কবিতায় বড় বেশী প্রত্যক্ষভাবে গিরিবালা দেবীর প্রসঙ্গ এসেছে। গিরিবালা দেবীর সঙ্গে কবির প্রণয় এবং প্রণয়ে ব্যর্থতার জ্বালা-যন্ত্রণা, অভিমান-অভিযোগ, হতাশা ও বিরহের হাহাকার, স্মৃতি-চারণ ইত্যাদিই কায়কোবাদের 'প্রেমের ফুল' কাব্যের প্রেমের কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে।

'প্রেমের ফুল' কবিতায় গিরিবালা দেবীর প্রসঙ্গ একেবারে সরাসরি এসেছে। কবিতাটিতে কবি গিরিবালা দেবীকে নিয়ে কাটানো অতীতের স্মৃতিময় দিনগুলোর কথা স্মরণ করেছেন। এই গিরিবালা দেবীই কবির প্রিয়া। কবি-প্রিয়া কবিকে বেলী ফুলের মালা গেঁথে উপহার দিতেন, আর কবি তাঁকে কবিতা লিখে উপহার দিতেন— এসব স্মৃতির কথা মনে করে কবি শেষে অভিমান ভরে উচ্চারণ করেছেন :

কি করে পরের সনে
হ'লে তুমি পরিণীতা?
জ্বালিয়ে আমার প্রাণে
এ ঘোর জ্বলন্ত চিতা!

(প্রেমের ফুল : প্রেমের ফুল : পৃ. ৩৮)

কবির মতে প্রিয়া তাঁর বিয়েতে অস্বীকার করলে আজ এই হাহাকার আসতো না জীবনে। প্রিয়াকে হারিয়ে কবি আজ পথের সন্ন্যাসী সেজেছেন। 'একদিনের ভুল' কবিতাতেও কবি অভিমান করেছেন, অভিযোগ প্রকাশ করেছেন কেন কবি-প্রিয়া তাঁর বিয়েতে অস্বীকার করেন নি, সবকিছু খুলে পিতাকে বলেননি, কুমারী জীবন যাপনের প্রস্তাব করেন নি। এভাবে কবি ব্যক্তিগত-স্মৃতি ও ঘটনাকে সরাসরি তাঁর কবিতায় নিয়ে এসেছেন। 'প্রেমের ফুল' কাব্যের অনেক কবিতায় বার বার 'চিঠি'র প্রসঙ্গ এসেছে। কখনও কবির চিঠি লেখার কথা, কখনও বা তাঁর প্রিয়ার চিঠি লেখার কথা, চিঠিতে অভিযোগ প্রকাশের কথা, কখনও বা চিঠি লিখে উত্তর না পাওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ বার বার এসেছে। এমন কি 'একখানা চিঠি তার', 'প্রেমপত্র' নামে দু'টি কবিতাও রয়েছে। প্রিয়ার চিঠির জন্য কবির ব্যাকুলতা, না পাওয়াতে গভীর দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন কবিতায়। অতীতের স্মৃতি স্মরণ করে কবি তাঁর প্রিয়ার উদ্দেশে বলেছেন :

কত চিঠি লিখেছিলে
মনে কি তা পড়ে রাণি!
রেখেছি তা' বুকের মাঝে
আজো আমি দিন যামিনী।

(ফুলের রাণী : প্রেমের ফুল : পৃ. ৪৩)

বিরহী কবি প্রিয়ার স্মৃতি বুকে আঁকড়ে বেঁচে আছেন। অতীতের স্মৃতি কবির মনে ছবির মত ভেসে ওঠে। প্রেমের ফুল, শৈশব স্মৃতি, ফুলের রাণী, সে আজি কোথায় গেছে চলে, শৈশব সঙ্গিনী, কোথায় রহিলে তুমি আজি প্রভৃতি কবিতায় কবি অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে হৃদয়ে গভীর ব্যথা অনুভব করেছেন। কবি তাঁর প্রিয়ার উদ্দেশ্যে বলেছেন

মনে কি পড়ে না প্রিয়ে
সেই তটিনীর তীর?
সেই তরু সেই শিলা
সেই কালিন্দীর নীর?
(প্রেমের ফুল : ঐ : পৃ. ৩৩)

যার উদ্দেশে বলেছেন সে আজ কাছে নেই, শুধু তার স্মৃতিটুকু পড়ে আছে। কবি তার স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছেন এবং সর্বত্র তাকে খুঁজছেন। প্রিয়ার ছবি নিয়ে তীর্থে তীর্থে বেড়াচ্ছেন যদি হঠাৎ তার দেখা পান। কিন্তু কোথাও প্রিয়ার দেখা পান না। কবির কণ্ঠে আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হয়েছে—

কত দিবা-কত রাতি,　　খুঁজিলাম পাঁতি পাঁতি
কত না নিভৃত কুঞ্জে
কত বন-পথে!
দেখা ত হল না তার সাথে!
(দেখা ত হল না তার সাথে : প্রেমের ফুল : পৃ. ১০৬)

প্রিয়াকে কোথাও না পেয়ে হতাশায় কবি আশংকাগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন, তিনি ভাবছেন :

সে বুঝি ভুলিয়া গেছে,　　তাই সে আসে না কাছে
থাকে সদা অতি দূরে দূরে
আমি যে তাহার লাগি　　হইয়াছি গৃহত্যাগী
আর কি পাবনা আমি তারে?
(আর কি পাবনা আমি তারে : ঐ : পৃ. ৮১)

কবি তাঁর প্রিয়াকে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তিনি তাঁর এই বিরহ দশার জন্যে বার বার প্রিয়াকে অভিযুক্ত করেছেন। প্রায় প্রতিটি কবিতায়ই প্রিয়ার প্রতি তাঁর অভিযোগ ধ্বনিত হয়েছে। প্রিয়াকে 'কঠিন হৃদয়' 'পাষাণী' ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করেছেন। শুধু প্রিয়ার প্রতিই নয়, সমস্ত নারী জাতির প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং অভিযোগ করেছেন :

রমণী কঠিন অতি নাহি জানে প্রেম-প্রীতি
পুরুষের প্রাণ নিতে চতুর সে বড়!
ছলে বলে সুকৌশলে ভুলায়ে পুরুষ দলে
ঘর করে বাহির, বাহির করে ঘর!
(কোথায় রহিলে তুমি আজি : ঐ : পৃ. ৯৭)

অন্যত্র,

নারী-বেশে সে যে বিশ্বে
সাক্ষাৎ ছলনা শুধু
অন্তর গরলে ভরা
মুখ ভরা প্রেম-মধু!
(নিরাশ প্রেমিক : ঐ : পৃ. ৮৯)

প্রিয়াকে অভিযুক্ত করেও কবি তাঁর হৃদয়ের যন্ত্রণাকে, বিরহ-কাতরতাকে দূর করতে পারেন নি। তাই তিনি নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছেন এই ভেবে যে, বিচ্ছেদের মাঝেই প্রেমের সুখ নিহিত, মিলনে তা ফুরিয়ে যায়। প্রিয়াকে পাওয়া-না-পাওয়াতে কবির দুঃখ নেই। কারণ তিনি দৈহিক মিলন চান না, প্রাণের মিলনই তাঁর কাছে কাম্য। কবির প্রেম 'কামজ' নয়, তাঁর প্রেমের 'স্বর্গের ফুল', পৃথিবীর সাম্রাজ্যও তার সমতুল্য নয়। "আমি ত তাহার দৈহিক মিলনের আকাঙ্ক্ষী নহি, আমি প্রাণের মিলন চাহি; আমার দুঃখ কি? আমি যাহাকে ভালবাসি, আমি ত তাহাকে আমার প্রাণের মধ্যেই পেয়েছি। আমার হৃদয়-ফলকে তাহার প্রেমময়ী মূর্ত্তিটি ত অঙ্কিত হয়েই আছে।"[২৩] এখানে 'আমার দুঃখ কি' বলে কবি যে তাঁর বিরহ-যন্ত্রণাকে লুকোতে চেয়েছেন তা স্পষ্টই বোঝা যায়। কারণ, কবি অন্যত্র বলেছেন :

চাহিনে জীবন চাহিনে মরণ
শুধু চাহি তার
মুখে মুখ দিয়া
বুকের উপর পড়িব ঢলিয়া
পান করি তার
অধর-অমিয়া!
(সে আসিবে কবে : প্রেমের ফুল : পৃ. ১৩৫)

প্রিয়াকে কাছে পাওয়ার এই যে ব্যাকুলতা ও গভীর বাস্তবতা তা-ই কায়কোবাদের প্রেম-ভাবনার বড় বৈশিষ্ট্য। প্রেমই তাঁর কাছে বড়। এই প্রেমের জন্য, প্রিয়ার জন্য তিনি স্বর্গের সুখকেও ত্যাগ করতে পারেন। প্রিয়াকে কাছে পেলেই তিনি স্বর্গ-সুখ পাবেন বলে মনে করেন। তিনি আপন প্রিয়াকে বলেছেন :

তোমার মুখের একটি চুমো
স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ মানি।
(ফুলের রাণী : প্রেমের ফুল : পৃ. ৪৩)

অন্যত্র,

চাইনে স্বর্গ ধন সাম্রাজ্য
একবার যদি পাই তাহারে।
(প্রেমের রাণী : প্রেমের ফুল : পৃ. ১০৮)

কারণ কবির বিশ্বাস,

প্রেম ত চাহে না ধন, চায় প্রেমিকের প্রাণ
আত্ম বিনিময়ে চাহে, আত্ম প্রাণ বলিদান ।
(বিরহ : ঐ : পৃ. ১০৩)

এভাবে কায়কোবাদের প্রেম-ভাবনা ব্যক্তিগত-অনুভূতি জাত হলেও শেষ পর্যন্ত তা চিরন্তন প্রেমিক হৃদয়ের অনুভূতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যক্তি অনুভূতিই হয়ে উঠেছে সর্বকালের প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়াকুতি ও হৃদয়ানুভূতি । অবশ্য অধিকাংশ কবিতাই ব্যক্তিক অনুভূতির আবেদন সার্বজনীন আবেদনে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রেম-ভাবনা কায়কোবাদের কবিকল্পনাকে যেমন উদ্বেলিত করেছে প্রকৃতি-চেতনাও তেমনি তাঁর কবি সত্তাকে করেছে উদ্ভাসিত। প্রকৃতি-প্রীতিতে তাঁর অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। 'প্রেমের ফুল' কাব্যেও আমরা বউ কথা কও, পাপিয়া, সন্ধ্যা-তারা, ভোরের পাখী, পিউ-পিউ-পিউ প্রভৃতি কবিতায় তাঁর প্রকৃতি-প্রীতির পরিচয় পাই। কবির বিরহ-বেদনা বিশ্বপ্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি 'পাপিয়া' পিউ-পিউ-পিউ পাখীর ডাকে তাঁর বিরহের

সুর শুনতে পান। প্রকৃতিই তাঁর প্রিয়ার সৌন্দর্যের আধার হয়, প্রকৃতি থেকে উপকরণ নিয়েই কবি তাঁর প্রিয়াকে সাজান। প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা আমরা তাঁর কবিতায় পাই,—

দিঘীর জলে কুমুদ বালা
কত কেঁদে কেঁদে,
অলস ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে
না দেখে তার চাঁদে।
(ভোরের পাখী : ঐ : পৃ. ১২৮)

কিংবা,

দলে দলে ধেনুগুলি
মাঠ হতে আসছে ফিরি!
সন্ধ্যা বায়ু ঢেউ খেলিয়ে
যাচ্ছে বয়ে ধীরি ধীড়ি।
(সন্ধ্যা তারা : প্রমের ফুল : পৃ. ১১৩)

সাত

বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে কায়কোবাদের গীতিকবিতা প্রশংসার দাবী রাখে তা আমরা 'অমিয়ধারা' ও 'প্রেমের ফুল' কাব্য দু'টির কবিতা নিয়ে আলোচনা করে দেখেছি। কবির হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতিই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে এসেছে। জীবনের সহজ-সরল অথচ বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তিই ফুটে উঠেছে তাঁর গীতিকবিতায়। এই সহজ-সরল ভাব ও অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার জন্যে কবি যে প্রকাশ-রীতি ও আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন তাও অত্যন্ত সহজ-সরল। কবি তাঁর অন্তরের ভাবকে অনাড়ম্বর অনলংকৃত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। আপন অনুভূতির গীতময় প্রকাশ ঘটিয়েছেন অত্যন্ত সহজভাবে। তাঁর কবিতার প্রকাশরীতিতে তাই সচেতন-শিল্প-প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। উপমা-রূপক প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন বাহুল্য নেই, শব্দ ব্যবহারেও নেই কোনরূপ নিগূঢ় শিল্প সাধনার পরিচয়। আপন হৃদয়ের আর্তনাদ-আকুলতা-আনন্দ-বেদনা ও অনুভবকে প্রকাশ করেছেন সহজ-সরলতায়। কবির অন্তর্লোকের নিবিড় অন্তরঙ্গতার স্পর্শ পাওয়া যায় তাঁর গীতিকবিতায়।

শব্দ-ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি দিলে লক্ষ্য করা যায় 'অমিয়ধারা' ও 'প্রেমের ফুল' দুটি কাব্যেই কায়কোবাদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহজ-সরল-নিরাভরণ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এতে কবিতার গতি হয়েছে স্বাভাবিক ও গীতময়। যেমন :

১　　কে ঐ বালা হে'সে হে'সে
এ'ল নিয়ে সাঁঝের বাতি।
নীল আকাশে উজল বেশে
জ্বলছে যাহা সারা রাতি।
(গোধুলি : অমিয়ধারা : পৃ. ৭২)

২　　কে অই শুনা'ল মোরে
আজানের ধ্বনি।
মর্ম্মে মর্ম্মে সেই সুর　　বাজিল কি সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনী!
কি মধুর
আজানের ধ্বনি!
(আজান : ঐ : পৃ. ২)

৩　　তুমি কি আমারে গিয়াছ ভুলে?
তোমার লাগিয়া　　কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ঘুরিয়া বেড়াই নদী-কূলে
তুমি কি আমারে গিয়াছ ভুলে?
(তুমি কি আমারে গিয়াছ ভুলে : প্রেমের ফুল : পৃ. ৭৬)

৪　　দেখিলে যাতনা বাড়ে
তবু তারে চেয়ে দেখি!
কত বুঝাইনু আমি
তবু ত বোঝে না আঁখি!
(নিরাশ প্রেমিক : প্রেমের ফুল : পৃ. ৮৮)

এমনিভাবে কায়কোবাদ অধিকাংশ কবিতায় সহজ-সরল শব্দ ব্যবহার করে ভাষার লালিত্য, কোমলতা ও গীতময়তা বৃদ্ধি করেছেন।

আবার প্রয়োজন অনুযায়ী যুক্তব্যঞ্জন-ধ্বনি ব্যবহার করে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। তাই অনেক কবিতায় আমরা যুক্তব্যঞ্জন-ধ্বনির ব্যবহারও লক্ষ্য করি। বস্তুতঃ কায়কোবাদের কাব্যভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল, স্বতঃস্ফূর্ত ও গীতময়। মাঝে মাঝে যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনি প্রয়োগ করে কবি শব্দ ব্যবহারে বৈচিত্র্য এনে ভাবের গভীরতা বৃদ্ধি করেছেন।

উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারেও কায়কোবাদের কোন বিশেষ সাধনার প্রয়াস দেখা যায় না। উপমা-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির প্রয়োগ খুবই কম এবং এসব উপমা-উৎপ্রেক্ষা পরিচিত পরিবেশ থেকেই নিয়েছেন। চারপাশের প্রকৃতি, জীবন ও সমাজ থেকেই তিনি তাঁর উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। উপমা-রূপকের প্রয়োগ কায়কোবাদের গীতিকবিতায় খুব কম হলেও মাঝে মাঝে তাঁর উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ-নৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করে।

কায়কোবাদের উপমা প্রসঙ্গে প্রকৃতি এসেছে বার বার। ফুল, লতা, বলদ এগুলো বহুবার উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মাঝে-মধ্যে দু'একটি উপমা চমৎকারিত্বের দাবী রাখে। যেমন :

১ মরণে অন্তঃপুরে
স্মৃতিটুকু রবে পড়ে
তটিনীর রেখার মতন।
(স্মৃতি : অমিয়ধারা : পৃ. ২৭)

২ তারি নামের বাদাম তুলে টেনে ধর সেই ডুরী
তীরের মত ছুটবে তরী জমে যাবে পারী।
(দিন ত বয়ে গেল : ঐ : পৃ. ১২৬)

৩ সুখের নিশি আসছে বলে
নব বধূ কতই সুখী!
ভানুর প্রেমে মাতোয়ারা
কুঞ্জে যেমন সূর্য্যমুখী!
(সন্ধ্যা-তারা : প্রেমের ফুল : পৃ. ১১৪)

কায়কোবাদের কাব্যে উপমা-ব্যবহার একেবারে কম হলেও রূপকের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। পুরো বক্তব্যই রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এমন দু'একটি কবিতাও আছে তাঁর কাব্যে। রূপক-ব্যবহারেও কুশলতা লক্ষণীয় দু'একটি ক্ষেত্রে। যেমন:

১　　মায়ার শৃঙ্খলে তায়　　বাঁধিয়া ঘুরায় হায়
পাপ পুণ্য কিছুই সে
না পারে বুঝিতে!
(আজান : অমিয়ধারা : পৃ. ৫)

২　　জীবে জড়ে বিশ্ব জুড়ে　　প্রাণের বিজন পুরে
কি অন্তরে কি বাহিরে তারি প্রতিধ্বনি।
(ঐ : ঐ : পৃ. ৭)

৩　　সিক্তবাসে কত শোভা
কনক রঞ্জিত দেহ!
লাবণ্যের খনি যেন
অনঙ্গের বাস-গেহ।
(প্রেমের ফুল : প্রেমের ফুল : পৃ. ৩৫)

৪　　তুই কোথা আর আমি কোথা
মাঝখানে বিচ্ছেদের নদী
প্রাণটি আমার বেঁচে যেত
তুই একবার আসতি যদি।
(ভুলে যা সেই ভালবাসা : প্রেমের ফুল : পৃ. ৭৭)

উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ কায়কোবাদের গীতিকবিতায় তুলনামূলকভাবে বেশী দেখা যায়। এবং অনেক উৎপ্রেক্ষাই বেশ সুন্দর। যেমন :

১　　বসন্তে সরিষা ফুল
কত মনোলোভা!
মাঠগুলি হেসে হেসে　　সাজে রক্ত পীত বেশে
প্রকৃতি-সুন্দরী যেন
ধরে নব শোভা।
(আমার পল্লীখানি : অমিয়ধারা : পৃ. ১০৮)

২ পাতায় পাতায় শোভে তারা
যেন হিরার ফুল!
প্রকৃতির তুবড়ী যেন
সৌন্দর্যে অতুল!
(বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা : ঐ : পৃ. ১২৮)

৩ স্নানান্তে যে সিক্ত কেশ
নিতম্বে পড়িত দুলি!
রূপের সাগরে যেন
সোনালী কিরণ তুলি!
(প্রেমের ফুল : প্রেমের ফুল : পৃ. ৩৫)

৪ মুখানি তোমার নিরখিলে প্রিয়ে
বোধ হয় যেন ফুটন্ত গোলাবে ফুল!
প্রাণের ভিতরে কামনা-সাগরে
প্রেমের দেবতা যেন নাহি পায় কূল।
(তুমি কি আমারে গিয়াছ ভুলে : ঐ : পৃ. ৭৬)

কায়কোবাদের 'অমিয়ধারা' ও 'প্রেমের ফুল' কাব্য দুটিতেই অসংখ্য খণ্ড চিত্র রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলোই প্রায় চিত্রকল্পে উত্তীর্ণ। যেমন :

১ ঊষা ফুলেশ্বরী ফুল-ভূষা পরি
এ সুখ সময়ে আসি।
পূজিছে তাহারে হাদি-পুষ্প হারে
মুখেতে মধুর হাসি।
(জগদীশ্বর : অমিয়ধারা : পৃ. ১)

২ লোহিত ভানু অস্তাচলে
ধীরে ধীরে পড়ছে ঢলে!
ঝিক মিকিয়ে সোনার কিরণ
ঢেউ খেলিছে নদীর জলে!
(বৈতরণী নদীর তীরে : ঐ : পৃ. ১০)

৩　　দেহের সুগন্ধে তার　　মুগ্ধ অলি অনিবার
লজ্জা পায় তার কাছে গোলাব চামেলী
হাস্না হেনা যে সৌরভে,　　ফুটিতে চাহে না ভবে,
সরমে লুকায় মুখ জুঁই চাপা বেলী।
(কেন ভালবাসি : প্রেমের ফুল : পৃ. ৫৫)

৪　　গোলাপ কুঁড়ি　　মুচ্‌কে হেসে
দেখে চেয়ে চেয়ে
ভ্রমর এসে　　কানের কাছে
কি জানি যায় ক'য়ে!
(ভোরের পাখী : ঐ : পৃ. ১২৬)

ছন্দ-বিচারে দেখা যায় যে, কায়কোবাদ তাঁর দু'টি কাব্যে অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দই ব্যবহার করেছেন। তবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতাই বেশী। দু'টি কাব্যেই আমরা দু'ধরনের ছন্দ-প্রয়োগ দেখি। ফলে একদিকে যেমন কবিতায় গীতিধর্মিতা বজায় থেকেছে অন্যদিকে তেমনি ভাব-গভীরতাও প্রকাশ পেয়েছে।

স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ :

১　　তুমি যখন / সন্ধ্যা বেলা
গেছিলে মোর / ঘরের কোণে।
আমি তখন / আলোক জ্বেলে
ছিনু মত্ত / তোমার ধ্যানে।
(মরণ বাঁচন : অমিয়ধারা : পৃ. ১৭)

২　　নীল আকাশে / কোন্ পরতে
আছে আমার /
প্রাণের প্রিয়া! /

। । । । । । । । ।
যার বিচ্ছেদে / দিবা-নিশি।
। । । । । ।
উঠছে কেঁদে /
। । । । । ।
আমার হিয়া। /
(প্রেমের সাকী : প্রেমের ফুল : পৃ. ২০)

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ :

। ॥ । ॥ । । । । । । । । ।
১ যাবার সময় এল / ঘনাইয়া কাছে,
॥ ॥ । । । । । । । । । ।
অই মোর কর্ম্ম ভূমি / রল পড়ে পাছে !
। । । । । । ॥ । । । । ॥ । ।
কি করেছি ? কি লইয়া / যাব এই বেলা,
। । । । । ! । ॥ । । ॥ । ।
ফুরায়ে এল যে মোর / জীবনের খেলা।
(গন্তব্য স্থান : অমিয়ধারা : পৃ. ৪৭)

। । । । । ॥ । ।
২ দেখা ত হল না তার সাথে! /
॥ । । । । ॥ । । । । । । ॥
যার লেগে নিশি দিন, / ভেবে ভেবে তনু ক্ষীণ
। । । । । ॥
সে কেন এল না হায় /
। ॥ । । । ।
আমার সাক্ষাতে! /
। । । । । । । । । । । । । । । ।
সে কেন ঘোমটা দিয়ে / মুখখানা আচরিয়ে। /
। । । । । । । ।
সরমে সরিয়া গেল /
। ॥ । । ।
ঘরের কোণেতে! /
। । । । । । ॥ । ।
দেখা ত হলনা তার সাথে। /
(দেখা ত হল না তার সাথে : প্রেমের ফুল : পৃ. ১৫৫)

স্তবক-নির্মাণের ক্ষেত্রে কায়কোবাদ নির্দিষ্ট কোন রীতি ব্যবহার করেন নি। সেখানে তিনি একান্তই আবেগের বশীভূত। সে আবেগের

পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য তিনি বিচিত্র স্তবক-গুচ্ছ নির্মাণ করেছেন এবং যেখানে যতগুলি ছত্রের প্রয়োজন বোধ করেছেন সেখানে ততগুলি ছত্রই ব্যবহার করেছেন নির্বিবাদে। স্তবক-বিন্যাস-রীতিতে বৈচিত্র্য তাঁর কবিতার গীতিধর্মিতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। তিনি শুধু একই কাব্যে যে বিচিত্র স্তবকগুচ্ছ নির্মাণ করেছেন তা নয়, একই কবিতার মধ্যেও তিনি বিভিন্ন স্তবকগুচ্ছ নির্মাণ করেছেন। কাব্য দু'টি পড়লেই সে বৈচিত্র্যের পরিচয় অতি সহজেই ধরা পড়ে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

'অমিয়ধারা' কাব্যে এই বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত :

১ প্রভাত হইল　　বিহগ গাইল
　　উঠরে অবোধ মন
এ সুখ সময়ে,　　অলসের মত
　　কেন ঘুমে অচেতন।
　　(জগদীশ্বর : অমিয়ধারা : পৃ. ১)

২　　কে অই শু'নাল মোরে
　　আজানের ধ্বনি।
মর্ম্মে মর্ম্মে সেই সুর　　বাজিল কি সুমধুর
　　আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনী
　　কি মধুর
　　আজানের ধ্বনি।
　　(আজান : পৃ. ২)

৩ এম্‌নি করে কেঁদে কেঁদে
　　কতকাল আর থাক্‌বি পড়ে!
বেলা যে শেষ হয়ে এল
　　কবে তুই আর যাবি ঘরে!
　　(বৈতরণী নদীর তীরে : পৃ. ১৮)

৪ নিমিষের তরে দেখা
যেনরে বিজলি রেখা
　　নিমিষের তরে আলাপন!
　　(স্মৃতি : পৃ. ২৬)

৫ তোমার সুখে প্রেমের হাসি,
চোখের কোণে বিজলি রাশি,
আমায় করত ঘোর উদাসী,
ভুলতে তাহা পারিনে!
তুমি কোথায় আছ জানিনে!
(তুমি কোথায় আছ জানিনে : পৃ. ৭৫)

৬ কি করিতে এ'সেছিলি, কি করিয়া গেলি
যে তোরে পাঠা'ল ভবে তারে না চিনিলি
সারাটি জীবন তুই কাটালি অলসে
কামিনী–কাঞ্চন লয়ে রলি মোহবশে
একবার ভেবে তুই দেখ নিরিবিলি,
কি করিতে এসেছিলি, কি করিয়া গেলি।
(সঙ্গীহারা পথিক : পৃ. ৮৩)

'প্রেমের ফুল' কাব্যেও এ বৈচিত্র্য লক্ষণীয় :

১ দে না সাকি প্রেমের সুরা
পান করে হই আপন হারা!
প্রেমের প্রথম বড়ই সুখের
অন্তিমে হয় জীবন সারা!
(প্রেমের সুরা : পৃ. ৩)

২ তার ললাটে কাল তিলটি
দিবানিশি
মিলছে যেথা!
সেই স্থানে যে লুকিয়ে আছে
আমার প্রাণের
গোপন ব্যথা।
(প্রেমের সাকী : পৃ. ২১)

কায়কোবাদ বিচিত্র ধরনের স্তবকগুচ্ছ নির্মাণ করে তাঁর কবিতায় বৈচিত্র্য এনেছেন। ফলে কবিতায় গীতিধর্মী সুরটি হয়ে উঠেছে গভীর ব্যঞ্জনাময়।

বিষয়-বৈচিত্র্য ও প্রকাশরীতিতে—দু'দিক থেকেই কায়কোবাদ একজন গীতিকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। দু'টি ক্ষেত্রেই তাঁর আবেগ ও আন্তরিকতা তাঁকে গীতিকবির বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট করেছে। এই আবেগ ও আন্তরিকতা কায়কোবাদের গীতিকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবুল ফজল যথার্থই বলেছেন, "কায়কোবাদ-কাব্যের বিশেষ করে তাঁর খণ্ড কবিতার এক বড় বৈশিষ্ট্য আন্তরিকতা—তাঁর অন্তরের সুগভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অধিকাংশ গীতিকবিতায়। এ ক্ষেত্রে তাঁর কবি-সত্তার সততায় কোন রকম ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। কবি-সত্তায় তিনি খাঁটি ও অকৃত্রিম।"[২৩] 'অশ্রুমালা'র মতোই 'অমিয়ধারা' ও 'প্রেমের ফুল' কাব্য দুটিও কায়কোবাদের কবি-সত্তার এই সততায় ও অকৃত্রিমতায় উজ্জ্বল এবং সার্থক গীতিকাব্য হিসাবে উত্তীর্ণ। কাব্য দু'টিতে কবির নিজস্ব অনুভূতির, অন্তরঙ্গ অনুভবের, বিচিত্র অভিব্যক্তির সুন্দর গীতময় প্রকাশ ঘটেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ 'মহাশ্মশান', ষষ্ঠ সংস্করণ : জুন, ১৯৭৪। মুহম্মদ আবদুল হাই-এর 'নতুন সংস্করণের ভূমিকা' অবলম্বনে কায়কোবাদের জন্ম ও মৃত্যুর সময়কাল উল্লেখিত হল।

২ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বাংলা একাডেমী, প্র. প্র. ১৬ই জুন, ১৯৭০, পৃ. ৩১০

৩ কাজী আবদুল মান্নান : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩৭৬ (১৯৬৯), বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, পৃ. ৪৩৯

৪ মোহাম্মদ বদরুল আমীন খান ও দেওয়ান শামসুল হক সম্পাদিত 'মহাকবি কায়কোবাদ', প্র. প্র. ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৯০, রফিকুল ইসলাম, কায়কোবাদ, পৃ. ৯১, অপূর্ণ।

৫ 'মহাশ্মশান' ষষ্ঠ সংস্করণ : জুন, ১৯৭৪, 'কবির ভূমিকা' পৃ. ।।/. থেকে উদ্ধৃত।

৬ 'সাহিত্য পত্রিকা', অষ্টাবিংশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯১, ফাতেমা কাওসার, 'গীতিকবি কায়কোবাদ : অশ্রুমালা প্রসঙ্গ', দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৪০-৬৬

৭ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৪

৮ 'সাহিত্য পত্রিকা', অষ্টাবিংশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৯১, পূর্বোক্ত নিবন্ধে 'অশ্রুমালা' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৯ 'অশ্রুমালা', ষষ্ঠ সংস্করণ : আষাঢ়, ১৩৬৬, কাব্য-কবি ও সমালোচক, পৃষ্ঠা ২০৪

১০ আবুল ফজল সম্পাদিত 'কাব্য সংকলন : কায়কোবাদ', প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৭৪, বইঘর, চট্টগ্রাম, 'কায়কোবাদ : কাব্য পরিচিতি' অংশ, পৃ. ১৭

১১ আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, তৃতীয় প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৯০; সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ২২৮

১২ মোহাম্মদ বদরুল আমীন খান : কবি কায়কোবাদের কাব্য ভাবনা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮০, পৃ. ১৫

১৩ 'অমিয়ধারা' তৃতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৭৬। এই সংস্করণ থেকেই বর্তমান নিবন্ধে প্রয়োজনীয় কবিতার উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে।

১৪ 'অমিয়ধারা', পূর্বোক্ত, 'দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

১৫ মোহাম্মদ বদরুল আমীন খান ও দেওয়ান শামসুল হক সম্পাদিত 'মহাকবি কায়কোবাদ', পূর্বোক্ত, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, কবি কায়কোবাদের গীতিকবিতা, পৃ. ১০০

১৬ মোহাম্মদ বদরুল আমীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

১৭ আবুল ফজল সম্পাদিত 'কাব্য-সংকলন : কায়কোবাদ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

১৮ মোহাম্মদ বদরুল আমীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

১৯ 'প্রেমের ফুল', প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৭৬, গ্রন্থকারের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২০ পূর্বোক্ত

২১ পূর্বোক্ত

২২ পূর্বোক্ত, গ্রন্থাকারের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২৩ আবুল ফজল সম্পাদিত, 'কাব্য-সংকলন : কায়কোবাদ' পূর্বোক্ত, পৃ. ২০